ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1390-1400
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.359

নৈতিকতায় মনস্তত্ত্বের ভূমিকা

রত্না সরকার, *গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In our daily lives, we constantly engage in various activities through which we try to achieve our goals, and by doing so, we directly contribute to the well-being of the people around us and the development of our society. Through appropriate actions, an individual helps in their own progress as well as the advancement of society. The morality of actions, notions of good and bad, etc., are included within ethics. Morality is expressed through individuals and the moral norms of their society; however, the moral norms of every society are not the same. Moral philosophers believe that moral principles are universal, independent of time and place. Therefore, human beings are always bound by moral principles.

Moral development of a person is closely related to morality itself. The role of psychology in moral development is very important, because human moral behavior, decisions, and values are all deeply connected with mental processes. Psychology explains how people learn morality from childhood to adulthood.

Therefore, in this article, the discussion has focused on moral development as it is closely connected with ethics. What is meant by moral development and what its conditions are have been discussed in this paper. An individual's moral development is linked with their mental development; hence, how a person's moral level is related to their mind and the views of psychologists on this matter have also been presented in this paper.

In the field of moral development, how an individual progresses through various constructive mental stages and accelerates their development has been discussed with reference to the opinions of psychologists such as Piaget and Lawrence Kohlberg, which are also included in this article.

Keywords: Ethics, Morality, Psychology, Society, Moral Development.

নীতিবিদ্যা বা এথিক্স[১] দর্শনের একটি অন্যতম শাখা। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড আমেরিকান ডিকশনারি অনুযায়ী নীতিবিদ্যা হল নৈতিক নীতি যা কোন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে। তবে নীতিবিদ্যা এবং "নৈতিকতা" বা "ম্যরালিটি"[২] এই দুটি ধারণাকে প্রতিশব্দ হিসেবে এবং স্বতন্ত্রভাবে উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যায়। এথিক্স শব্দটির একটি গ্রিক ভিত্তি রয়েছে। গ্রিক শব্দ "এথোস"[৩] থেকে ইংরাজি "এথিক্স" কথাটি

[১] Ethics

[২] Morality

[৩] Ethos

এসেছে। প্রাচীন গ্রিসের দুটি ভিন্ন বানান অনুযায়ী এর দুটি অর্থ উঠে আসে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে হোমার ও হেসিওড –এর মহাকাব্য গুলিতে এথিক্স শব্দটির খোঁজ পাই। গ্রিক মহাকাব্যে এথোস– এর অর্থ ছিল কোনো প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান বা আবাসস্থল অর্থাৎ যেখানে কেউ অভ্যস্থ ভাবে বাস করে, উদাহরণস্বরূপ "Lliad"-এ ঘোড়ার habitual place বা থাকার জায়গা বোঝাতে এই ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। একইভাবে "Works and Days"- এও পদটি প্রাণীর স্বাভাবিক আবাস বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্তৃতভাবে এথোস সেই স্থানটিকে বোঝায় যেখানে পশুরা আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে "এথোস" – এর অপর একটি অর্থ হল রীতি, প্রথা বা অভ্যাস। যা একজন ব্যক্তির জীবনযাপন পদ্ধতি, অভ্যাস এবং চরিত্রকেও নির্দেশ করে। প্রসারিত অর্থে এর দ্বারা সামাজিক রীতিনীতি বা আচরণ বিধিও বোঝানো হয়। আসলে গ্রিক ভাষায় এথোসের দুটি পদের দুটি ভিন্ন অর্থ বিদ্যমান। কিন্তু গ্রিক সাহিত্য লাতিন ভাষায় অনুবাদকালে একটিমাত্র লাতিন পদ 'মোস'[৪] যার অর্থ 'অভ্যাস', 'প্রথা', 'চরিত্র', এবং 'নিয়ম' দ্বারা প্রাচীন এবং তার পরবর্তী দুটি গ্রিক পদকেই অনুবাদ করা হয়েছিল। অর্থাৎ গ্রিক ভাষায় এথোসের উভয় অর্থই লাতিন মোস পদটি দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল, লাতিন ভাষায় যার মূল হল 'ম্যরালস' বা 'নৈতিকতা'।

বিংশ শতাব্দীতে মার্টিন হাইডেগারের "লেটার অন হিউম্যনিজম"[৫] এ এথোসের একটি নির্দিষ্ট অর্থ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। মার্টিন হাইডেগার উন্মোচন করেন যে, এথোস হল মানুষের dwelling place বা বাসস্থান যেখানে মানুষের বিয়িং প্রকাশিত হয় তাই এথিক্স বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের বিয়িং(being)-এর মধ্যে বাস করার ধরন। আসলে দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিবিদ্যা এবং নৈতিকতা শব্দটি ব্যবহৃত হয় প্রতিশব্দ হিসেবে যা বর্তমান সাহিত্যে বেশ প্রচলিত, আবার স্বতন্ত্র একটি ধারণা হিসেবেও ক্রমবর্ধমান স্কলারদের কাছেও এটি একটি বিকল্প। যে সকল ব্যক্তি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিবিদ্যা এবং নৈতিকতাকে নির্বিচারে ব্যবহার করেন তারা যুক্তি দেন যে, দুটি শব্দের উৎস স্বতন্ত্র হলেও তারা অভিন্ন অর্থ বহন করে।

এথিক্স বা নীতিবিদ্যাকে আবার 'ম্যরাল ফিলসফি'[৬] অর্থাৎ নীতি দর্শনও বলা হয়। 'ম্যরাল' শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'মোরেস'[৭] থেকে যার অর্থ হল অভ্যাস বা রীতি-নীতি। তাই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের অভ্যাসজাত আচরণ বা রীতিসম্মত আচরণ। নীতিবিদ্যায় একটি আদর্শের নিরীখে আমাদের আচরণের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়েই মানুষ কিছু নিয়মাবলী অনুসরণ করে তার কাজকর্ম সম্পন্ন করে। নিজেকে আদর্শবান করে তোলার একটা ঝোঁক মানুষের মধ্যে রয়েছে। নৈতিকতাকে আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের জানতে হবে কেন বা কোন নিয়মানুযায়ী আমরা কাজ করি? সেই নিয়মের ভিত্তি কি বা উৎপত্তি কোথায়? কে বা কারা সেই নিয়ম প্রণেতা? কিসের ভিত্তিতে সেই নিয়ম প্রতিষ্ঠা হল এবং সমাজে স্বীকৃত পেল ইত্যাদি।

নৈতিক বিধিগুলি সার্বজনীন, অর্থাৎ তা সকলের জন্য সমান। কোন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি নৈতিক বিধি অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে একই আচরণ করবে। নীতিদার্শনিকরা দাবি করেন নৈতিকবিধি সর্বদা শর্তহীন। আর শর্তহীনতার কারণেই তা সার্বজনীন। নৈতিকবিধি গুলি হল যুক্তিনির্ভর বা বুদ্ধিনির্ভর। ব্যক্তিগত অনুভূতি সমূহ বা স্বার্থ নৈতিকবিধি বা নৈতিকতার ভিত্তি নয়। অন্যের স্বার্থও নৈতিকতায়

---

[৪] Mos

[৫] *Letter on Humanism*

[৬] Moral Philosophy

[৭] Mores

প্রাধান্য পায়। সমাজ এবং জাতিভেদে তার নৈতিক ভাবধারা, রীতি-নীতি, আচরণাদি ভিন্ন ভিন্ন হয়। একটি সমাজের ভাবধারা, আদর্শ, নিয়মাবলী প্রভৃতি হল সেই সমাজের নৈতিকতা বা নৈতিক পরিবেশ। ব্যক্তির ওপর তার সমাজের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। ব্যক্তি যে সমাজের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে সেই সমাজের রীতি-নীতি, ভাবধারা, নিয়মাবলী প্রভৃতি ব্যক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুকরণের মাধ্যমে সেই সমাজের নৈতিক পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র বা আচরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়।

প্রত্যেক আলোচনারই কিছু বিষয়বস্তু থাকে, তেমনি নীতিবিদ্যারও কিছু আলোচ্য বিষয় আছে। নীতিবিদ্যার সেই আলোচ্য বিষয় হল নীতিবিদ্যার পরিসর। নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের আচরণ এবং ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিতে কোন কাজটি ভাল বা মন্দ, ন্যায় অথবা অন্যায় প্রভৃতি নির্ণয় করাও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। তবে যে কোন মানুষের যে কোন কর্মই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। শিশু, উম্মাদ, পশু প্রভৃতিকে তাদের কাজের জন্য দায়ী করা যায় না, কারণ তাদের বিচার ক্ষমতা নেই; তাই তাদের কাজকে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায় না। ব্যক্তির বিচার ক্ষমতা বা বিচার করার সামর্থ্য একমাত্র তার ঐচ্ছিক কর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যে কাজ আমরা অভ্যাসবশত করে থাকি অথবা যে কাজের পশ্চাতে আমাদের কোন সচেতন উদ্দেশ্য থাকে না তাই অনৈচ্ছিক কর্ম। অপরদিকে, কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য পরিকল্পনামাফিক যে কাজ আমরা করে থাকি তাই ঐচ্ছিক কর্ম। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্মই একমাত্র প্রাধান্য পায়। তাই ঐচ্ছিক কর্ম থেকে উদ্ভূত আচরণের নৈতিক মূল্য বিচার করাই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ঐচ্ছিক কর্মের সাথে ব্যক্তির কামনা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ইত্যাদি মানসিক অবস্থাও যুক্ত থাকে, ফলে এই সকল মনোবিজ্ঞানের বিষয়ও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। আমরা জানি যে অনৈচ্ছিক কর্মের নৈতিক বিচার হয় না, ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্মেরই একমাত্র ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তির কর্মের স্বাধীনতা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে ঐচ্ছিক কর্মেরও নৈতিক বিচার সম্ভব হয় না। ব্যক্তির কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, ব্যক্তির সেই বিশেষ কর্মটি করার অথবা না করার এই দুইয়ের স্বাধীনতাই ছিল। যে কাজে ব্যক্তি বাহ্যশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় অথবা যে কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরাধীন সেই কাজের জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় না। এই ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক কর্ম, তাদের প্রভেদ, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি নীতিবিদ্যার সাথে সাথে মনোবিজ্ঞানেও আলোচিত হয়। তবে নৈতিক বিচারের সাথে যুক্ত এই মানসিক স্তরটি বেশ জটিল কারণ মানসিক স্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা পর্যায় অতিক্রম করে ব্যক্তি দৈহিক স্তরে প্রবেশ করে। কারণ কামনা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য ব্যক্তি দৈহিক কর্ম তথা অঙ্গ-প্রতঙ্গ সঞ্চালনরূপ কর্ম করে থাকে।

মনোবিজ্ঞান হল মন এবং আচরণের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। মনোবিজ্ঞানে চেতন এবং অচেতন ঘটনার পাশাপাশি অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের কাজ হল ব্যক্তির আচরণকে বোঝা। ব্যক্তির মনকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিন ধরনের উপাদান পাই– ১. চিন্তা ২. অনুভূতি এবং ৩. ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। এই উপাদানসমূহের উৎপত্তি কিভাবে অথবা এদের স্বরূপ, প্রকারভেদ প্রভৃতি আলোচনা মনোবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। নীতিবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, উভয়েই মানুষের আচরণ, কামনা, অভিপ্রায় প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে, ফলত উভয়ের মধ্যেই একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। কী ধরনের কর্ম আমাদের করা উচিত বা কোন ধরনের কর্ম থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত তা নীতিবিদ্যা আমাদের বলে দেয়। কিন্তু তার আগে আমাদের এটা জানা প্রয়োজন যে কেন আমরা সেই কর্মে প্রবৃত্ত হলাম অথবা কোন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হলাম যা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পারি। অর্থাৎ ব্যক্তির কোন কর্মের নৈতিকতা বিচারের ক্ষেত্রে সেই কর্মের পশ্চাতে যে

ইচ্ছা রয়েছে তার প্রকৃতি, গঠন, ইচ্ছার সাথে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণসমূহের সম্পর্ক, উদ্দেশ্য ইত্যাদির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়– এগুলি সম্পর্কে কোন সন্দেহজনক এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান 'নিখুঁত ভালো'[৮] বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে। যে কোন নৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য সেই নৈতিক পরিস্থিতির একটি পূর্ণাঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া কোন নৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝা এবং নীতিবিদ্যাকে ব্যবহারিক করে তোলা দুরূহ। নীতিবিদ্যায় নৈতিকতা বোধের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি জানার জন্য আমাদের মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই একথা বলাই যায় যে সঠিক নৈতিকতার একটি ভিত্তি হল সঠিক মনোবিজ্ঞান। তাই বলা যায় নীতিবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নীতিবিদ্যা মানুষের কাছে কিছু আদর্শ তুলে ধরে এবং মনোবিজ্ঞান সেগুলিকে ব্যবহার্য করার পরামর্শ দেয়।

মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজ তথা সমাজবিজ্ঞানের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সমাজের কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে কিভাবে সে তার নিজের এবং তাদের সামাজিক পরিচিতি সনাক্ত করে তার ওপর। ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে সমাজে নিজের একাত্মতা ও নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সমাজ হল কিছু মানুষের সমষ্টি যারা পরস্পর একটি অভিন্ন সংস্কৃতি এবং শারীরিক অবস্থান ভাগ করে নেয়। সামাজিক ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সেই অনুযায়ী সে যে জাতি, বর্ণ, শ্রেণির অন্তর্গত সেই সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞান। ব্যক্তির সুরক্ষা, আত্মমর্যাদা, সামাজিকীকরণ এবং কোন সম্প্রদায়ে থাকার জন্য ব্যক্তির সামাজিক ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক ঘটনার একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে বর্তমানে একটি নতুন শাখা গড়ে উঠেছে যা 'সামাজিক মনোবিজ্ঞান'[৯] নামে পরিচিতি লাভ করেছে। একইভাবে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা গুলিকে বোঝার জন্য সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়; কারণ ব্যক্তির মন, ব্যক্তিত্ব[১০] প্রভৃতি সামাজিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই এই সকল বিষয় ভালোভাবে বোঝার জন্য মনোবিজ্ঞান সমাজ তথা সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য নেয়। একইভাবে নীতিবিজ্ঞানের সাথে সমাজ তথা সমাজবিজ্ঞানেরও একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সামাজিক আচরণ, চিন্তাভাবনা, সামাজিক সম্পর্ক, সমাজের ক্রমবিকাশ, রীতি-নীতি, ভাষা, কাজকর্ম প্রভৃতি বিষয়ের দিকে সমাজবিজ্ঞান আলোকপাত করে। এককথায় সমাজবিজ্ঞান হল মনুষ্য সমাজের যাবতীয় বিষয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা। আমরা দেখেছি যে নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক মূল্য নির্ণয় করে, আর ব্যক্তি যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই সমাজে ব্যক্তির স্থান কী বা ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রভাব কী তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে সমাজস্থিত মানুষের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। সমাজই ব্যক্তির শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র; সমাজে বাস করেই ব্যক্তি নিজের বিকাশ সাধন করতে পারে, তাই সমাজ ছাড়া ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ সম্ভবপর নয়। এইদিক দিয়ে নীতিবিজ্ঞান সমাজ বা সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। আবার ব্যক্তি ছাড়া সমাজের অস্তিত্বও অর্থহীন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধতার ধারণা থেকে সমাজস্থিত ব্যক্তির নৈতিকবোধ জাগ্রত হয়। যে সমাজে সৎ বা ভালো ব্যক্তির অস্তিত্ব যত বেশী সেই সমাজ তত উন্নত, এবং সেই সমাজের নৈতিক জীবনও তত উন্নত। তাই বলা যায় ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

---

[৮] Perfect good

[৯] Social Psychology

[১০] Personality

তাহলে দেখা গেল নৈতিকতা বা নীতিবিদ্যা মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান কে ছাড়া বিকাশ লাভ করতে পারে না। নৈতিকতা, সমাজ এবং মনোবিজ্ঞানের মধ্যে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। তাহলে এখন বলাই যায় যে, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ হল নৈতিক বিকাশের অন্যতম দুটি শর্ত। এখন প্রশ্ন ওঠে নৈতিক বিকাশ বা ম্যরাল ডেভেলপমেন্ট[১১] বলতে আমরা কি বুঝি? এর উত্তরে বলা যায়, নৈতিক বিকাশ বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার দ্বারা শিশু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনি নিয়মাবলীর ওপর ভিত্তি করে সমাজের ঠিক-ভুল, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি সম্পর্কে একটি ক্রমবর্ধমান ধারণা গঠন করতে পারে। এটি এমন কিছু আচরণবিধির নির্দেশ দেয় যা ব্যক্তির সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ থেকে উদ্ভূদ হয়ে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ, আচরণ ও চিন্তাভাবনা কে পরিচালনা করে। নৈতিক বিকাশের নানাবিধ ধারণা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তিত হয়েছে; এই জন্যই একজন শিশুর নৈতিক রায়, আচরণ, চরিত্র প্রভৃতি একজন প্রাপ্ত বয়স্কের থেকে আলাদা। একদম প্রথমদিকে নৈতিক বিকাশের তত্ত্বগুলি এসেছিল অ্যারিস্টটল, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের থেকে। কিন্তু আধুনিক যুগে জা পিঁয়াজে, লরেন্স কোলবার্গ, প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের থেকে আমরা নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি। এইসব মনস্তাত্ত্বিকদের মতে আমরা নৈতিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হই।

পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়াটি একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া যেখানে কর্ম এবং চিন্তার আন্তঃব্যবস্থা ব্যক্তির নৈতিক ধারণা গঠন করে। পিঁয়াজে মনে করেন শিশুর বড়ো হওয়া এবং পরিপক্ক (mature) হওয়ার ক্ষেত্রে শিশু নৈতিকতার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। তিনি নৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শিশুর যুক্তির ধরনের ওপর ভিত্তি করে তাঁর নৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত গবেষণাকার্যটি করেছেন। অবিচক্ষণতা, চুরি করা, মিথ্যা বলা প্রভৃতি ক্ষেত্র গুলিতে শিশু কিভাবে তার যুক্তি প্রয়োগ করে তা জানার জন্য পিঁয়াজে কিছু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালান এবং এই প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত কিছু গল্প তৈরি করেন, আর শিশুদের থেকে সেইসকল গল্প বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে নিয়মাবলী, শাস্তি, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কে শিশুর ধারণা গুলি বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। পিঁয়াজে মূলত শিশুরা কি করে অথবা করে না সে বিষয়ে আগ্রহী নন, বরং শিশুরা কিভাবে চিন্তা করছে বা যুক্তি প্রয়োগ করছে সে বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে শিশু যখন জ্ঞানীয় দিক থেকে পরিপক্ক হয় তখন একটি বিষয়কে একাধিক দিক থেকে দেখার ফলে তারা বেশী ভালো নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পিঁয়াজে মনে করেন আমাদের জ্ঞানীয় বিকাশের যেমন পর্যায় রয়েছে তেমনি নৈতিক বিকাশেরও কিছু পর্যায় রয়েছে, এবং আমাদের নৈতিক বিকাশ জ্ঞানীয় বিকাশের সাথে যুক্ত। পিঁয়াজে নৈতিক বিকাশের দুটি মূল স্তরের কথা বলেন–

১. বিষম নৈতিকতা: বিষম নৈতিকতা বা হেটেরোন্যমাস ম্যরালিটিকে[১২] নৈতিক বাস্তববাদ বা ম্যরাল রিয়েলিজম[১৩] ও বলা হয়ে থাকে। পিঁয়াজে বলেন দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর নিয়ম বা বিধি সম্পর্কে কোন সচেতনতা থাকে না এবং এই বয়সে শিশুর কাজকর্ম তার পেশী সঞ্চালন বা অঙ্গসঞ্চালন ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা পরিচালিত নয়। এই সময়ে শিশু কোনরূপ সামাজিক সহযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে না এবং সব কিছুই তারা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পচ্ছন্দ-অপচ্ছন্দের ভিত্তিতে করে থাকে। দুই বছরের পর থেকে সাত বছর পর্যন্ত শিশু পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে থাকে। এই স্তরে শিশু তাদের নৈতিক ধারণা বিষয়ে কঠোর

[১১] Moral Development

[১২] Heteronomous Morality

[১৩] Moral Realism

থাকে। পিঁয়াজে এই প্রথম স্তরটিকে আবদ্ধতার নৈতিকতা[১৪] বলে অভিহিত করেছেন। এই স্তরে শিশু অভিপ্রায়ের পরিবর্তে কোন পরিস্থিতিকে তার ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করে থাকে। এই স্তরে শিশু আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার দরুণ এটা উপলব্ধি করতে পারেনা যে, একটি নৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝার একাধিক দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে, ফলে কোন আচরণের পশ্চাতে থাকা অভিপ্রায়কে তারা পরিমাপ করতে পারেনা। এই স্তরে শিশু মনে করে নৈতিকতা হল অভিভাবক, শিক্ষক বা ঈশ্বর এইরকম কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তির দ্বারা আরোপিত কিছু নিয়মাবলী যা অপরিবর্তনীয়, আর এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ হল কঠোর শাস্তিযোগ্য। শাস্তির উদ্দেশ্য হল অপরাধীর অপরাধবোধ জাগানো এবং তাকে এটা বোঝানো যে অন্যায়ের তীব্রতার সাথে শাস্তির তীব্রতা সম্পর্কিত। এই স্তরে শিশু মনে করে নিয়মগুলি হল ঐশ্বরিক এবং পরম যাকে পরিবর্তন করা যায় না, এবং নিয়মগুলি এখন যেমন ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। আমাদের আচরণ ঠিক অথবা ভুল হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আচরণ জন্য যে ফলাফল তার সাথে আপোস করার কোন অবস্থা থাকে না। সাত বছর বয়স অবধি শিশুর নিয়মাবলীর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল থাকে কারণ এই বয়সে নিয়মাবলীকে পবিত্র হিসেবে দেখা ছাড়া শিশুর আর কোন জ্ঞানীয় ক্ষমতা থাকে না। ছোট্ট মেরি তার মাকে চমক দেবার জন্য একটি পোশাখ সেলাই করতে উদ্যত হয়, কিন্তু সঠিকভাবে কাঁচির ব্যবহার না জানায় সে পোশাখটিতে একটি বড় ছিদ্র করে ফেলে। অপরদিকে, ছোট্ট মার্গারেট মায়ের অনুপস্থিতির সুযোগে মায়ের কাঁচি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে সঠিকভাবে কাঁচির ব্যবহার না জানায় সে তার পোশাখটিতে একটি ছোট ছিদ্র করে ফেলে। এই দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'কে বেশী দুষ্টু?' – এর উত্তরে তাদের সিদ্ধান্ত হবে, মেরি বেশী দুষ্টু। এক্ষেত্রে তারা দুষ্টুমির অভিপ্রায়ের পরিবর্তে পরিণতির তীব্রতার ওপর নির্ভর করে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়। আর সেই কারণেই এই স্তরে একটি বড় দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, একটি ছোট ইচ্ছাকৃত ক্ষতির তুলনায় খারাপ বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ এই স্তরে শিশুর নৈতিকতাটি হল সম্পূর্ণ বাহ্য আরোপিত।

২. স্বায়ত্তশাসিত নৈতিকতা: এটি হল পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তর। স্বায়ত্তশাসিত নৈতিকতা বা অটোন্যমাস ম্যরালিটিকে[১৫] নৈতিক আপেক্ষিকতা বা ম্যরাল রিলেটিভিজম[১৬] ও বলা হয়। অটোন্যমাস ম্যরালিটি বা স্বায়ত্তশাসিত নৈতিকতা বলতে সেই নৈতিকতাকে বোঝায় যা শিশুর নিজের নিয়মের বা আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। শিশু সাধারণত সাত বছরের পরে নৈতিক বিকাশের এই দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে, যাকে পিঁয়াজে সহযোগিতার নৈতিকতা[১৭] বলেছন। শিশু যখন সমবয়সীদের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন সে সমানভাবেই সবার সাথে মিলিত হয়, এই সাম্যতা তাদের পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করার সামাজিক পরিবেশ প্রদান করে। পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে শিশু জ্ঞানীয়ভাবে উন্নত হতে থাকে এবং স্কুল, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে তারা এক বিস্তীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হয়। তারা উপলব্ধি করে যে, পরম সত্য বা পরম মিথ্যা বলে কিছু হয় না এবং নৈতিকতা পরিণতির পরিবর্তে অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। পিঁয়াজে মনে করেন নয়, দশ বছর বয়সে শিশু নৈতিক সমস্যা গুলিকে নতুনভাবে বুঝতে শেখে। এই স্তরে শিশু শৈশবের চিন্তাভাবনা গুলিকে কাটিয়ে উঠতে থাকে এবং অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে তার নৈতিক নিয়মগুলিকে বোঝার ক্ষমতা বিকশিত হয়। শিশু যখন অপরের অভিপ্রায়, পরিস্থিতি প্রভৃতি বোঝার ক্ষেত্রে

[১৪] Morality of constraint

[১৫] Autonomous Morality

[১৬] Moral Relativism

[১৭] Morality of cooperation

বিকেন্দ্রীভূত হতে পারে সে অনেক বেশী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়, ফলস্বরূপ নৈতিক দায়িত্ব, শাস্তি, ন্যায়বিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত শিশুর ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তাদের চিন্তাভাবনা প্রাপ্তবয়স্কদের মত হয়ে ওঠে। এই স্তরে শিশু বুঝতে পারে নিয়মগুলি কোন ঐশ্বরিক উৎস থেকে আসে না; মানুষই নিয়মগুলি তৈরি করে আর মানুষই সেগুলির পরিবর্তন করে, এবং ভালো-মন্দের সংজ্ঞাও পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। শিশু বুঝতে পারে যে নিয়ম বা বিধি-নিষেধ ইত্যাদি পারস্পরিক সম্মতিতে গঠিত হয়; একটি সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করতে, কোন গোষ্ঠীর মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সুষ্ঠভাবে ক্রীড়া পরিচালনার জন্যই নিয়মগুলির প্রয়োজন হয়। এই স্তরে নিয়ম অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর সহযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে তাদের এক যাপিত অভিজ্ঞতা হয় যা তাদের নিজস্ব নৈতিকমান নির্ণয়ে সহায়তা করে। এই স্তরে শিশু আর আত্মকেন্দ্রিক থাকে না এবং একটি পরিস্থিতির পশ্চাতে থাকা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়, ফলস্বরূপ শিশু এই স্তরে কোন আচরণের পরিণতির পরিবর্তে তার পশ্চাতে থাকা অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে নৈতিক বিচার করতে সমর্থ হয়। এই পর্যায়ে শিশুর এই আত্মোপলব্ধি হয় যে, তাদের কোন আচরণ খারাপ বলে প্রতিপন্ন হলেও সেই আচরণের পশ্চাতে থাকা অভিপ্রায় যদি ভালো হয় তবে অনিবার্যভাবেই তাদের শাস্তি কাম্য নয়। পূর্ববর্তী স্তরের মেরি ও মার্গারেটের কাহিনীটিকে অনুসরণ করে যদি প্রশ্ন করা হয় 'কে বেশী দুষ্টু?' তবে এই স্তরের দশ অথবা দশোর্ধ্ব শিশুদের কাছে মার্গারেট হবে মেরির তুলনায় দুষ্টু। যদিও মার্গারেটের তুলনায় মেরির পোশাখের ছিদ্র বড় ছিল, কিন্তু মার্গারেটের কাজের পশ্চাতে কোন সৎ অভিপ্রায় না থাকায় এই স্তরের শিশুর কাছে মার্গারেট হল দুষ্টু। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে পিঁয়াজের মতানুসারে, শিশু তার জ্ঞানীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কিছুই জানতে পারে না, তাই শিশুর বয়স এবং মানসিক বিকাশ অনুযায়ী তার নিয়মাবলী বোঝার ক্ষমতাকে, তার যৌক্তিক ক্ষমতাকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানী লরেন্স কোলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বে জা পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বটিরই একটি পরিবর্তিত ও প্রসারিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কোলবার্গের কাছে নৈতিক বিকাশ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিশু তার বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর ভিত্তি করে সার্বজনীন নৈতিক নীতিগুলিকে আবিষ্কার করে। কোলবার্গ তাঁর তত্ত্বে মূলত শিশুরা কিভাবে তাদের নৈতিকতা এবং নৈতিক যুক্তির বিকাশ ঘটায় সেইদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কোলবার্গ পিঁয়াজের তত্ত্বকে প্রসারিত করলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, পিঁয়াজে নৈতিক বিকাশের দুটি স্তরের কথা বললেও কোলবার্গ তাঁর নৈতিক বিকাশ তত্ত্বে তিনটি স্তরের অন্তর্গত ছয়টি পর্যায়ের কথা বলেন। কোলবার্গের মতে নৈতিক বিকাশ হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা আজীবন ঘটে। নৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত কোলবার্গের তিনটি স্তর যথাক্রমে– প্রিকনভেনশনাল[১৮] বা প্রাক-প্রচলিত, কনভেনশনাল[১৯] বা প্রচলিত এবং পোস্ট-কনভেনশনাল[২০] বা উত্তর-প্রচলিত। কোলবার্গের গবেষণার ভিত্তি ছিল একাধিক নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং অনুরূপ নৈতিক দ্বন্দ্বে পড়লে ব্যক্তি কিভাবে তার কর্মকে ন্যায্যতা প্রদান করে তিনি সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। পিঁয়াজের কাহিনী বলার পদ্ধতিটি অনুসরণ করেই কোলবার্গ তাঁর নৈতিক দ্বন্দ্ব বিষয়ক কাহিনী গুলি বলেছিলেন। নৈতিক দ্বন্দ্ব বিষয়ে কোলবার্গের কাহিনীর গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল 'হাইঞ্জের দ্বন্দ্ব'[২১] এই দৃশ্যে হাইঞ্জের

[১৮] Preconventional

[১৯] Conventional

[২০] Postconventional

[২১] Heinz Dilemma

স্ত্রী এক বিশেষ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায়। চিকিৎসকের কথানুযায়ী এক বিশেষ ধরনের ড্রাগ তাকে বাঁচাতে পারে, যা স্থানীয় এক কেমিস্ট আবিষ্কার করেছিলেন। হাইঞ্জ ড্রাগটি কেনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু কেমিস্টটি ড্রাগের জন্য ব্যয় করা অর্থের দশ গুণ বেশী অর্থ মূল্যস্বরূপ দাবি করেন যা হাইঞ্জের সামর্থ্যের থেকে অনেক বেশী। পরিবার এবং বন্ধুদের সহায়তার পরেও হাইঞ্জ কেবলমাত্র অর্ধেক অর্থই জোগাড় করতে পেরেছিলেন। হাইঞ্জ কেমিস্টকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে সে ড্রাগটি সস্তায় পেতে পারে অথবা অত্যধিক মূল্য পরে পরিশোধ করতে পারেন; কিন্তু কেমিস্ট তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। হাইঞ্জ তার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার্থে মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং ফার্মেসি ভেঙ্গে ড্রাগটি চুরি করেন। এই কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে কোলবার্গ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত একাধিক প্রশ্ন করেন–

১. হাইঞ্জের কী ড্রাগ চুরি করা উচিত ছিল?
২. স্ত্রীর প্রতি হাইঞ্জের ভালোবাসা না থাকলে কী কোনো কিছু পরিবর্তন হত?
৩. মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি যদি অপরিচিত হতেন তাহলে কী কোনো পার্থক্য হত?
৪. মহিলাটি মারা গেলে তার হত্যার জন্য পুলিশ কী কেমিস্টকে গ্রেপ্তার করবে?

বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত এইসব প্রশ্নের উত্তর অধ্যয়ন করে কোলবার্গ লক্ষ্য করলেন, পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে কিভাবে ব্যক্তির নৈতিক যুক্তি পরিবর্তিত হয়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা হাইঞ্জের কর্মটিকে ঠিক অথবা ভুল বলে বিবেচনা করছে কিনা কোলবার্গ সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না, বরং তাদের বিবেচনার পশ্চাতে থাকা যুক্তি নিয়ে তিনি অধিক আগ্রহী ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই যুক্তিগুলি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। কোলবার্গ তাঁর নৈতিক বিকাশ তত্ত্বে এই যুক্তিগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়বদ্ধ করেন। পিঁয়াজে যেমন বিশ্বাস করতেন সবাই জ্ঞানীয় বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে না, কোলবার্গও তেমনি বিশ্বাস করতেন সকলে নৈতিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের তিনটি স্তর ও তার অন্তর্গত পর্যায়গুলি যথাক্রমে-

১. প্রাক-প্রচলিত নৈতিকতা: এটি হল কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের প্রথম স্তর। শিশুর প্রায় নয় বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরটি স্থায়ী হয়। এই স্তরে শিশুর কোন ব্যক্তিগত নৈতিক ভাবনা থাকে না। এই স্তরে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্তবয়স্কের তৈরি করা মানদন্ড অর্থাৎ তাদের তৈরি নিয়ম অনুসরণ করা বা তার বিরুদ্ধাচারণ করার ওপর শিশুর নৈতিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। এই স্তরে শিশু আত্মকেন্দ্রিক হয়, কোন কর্মকে তার পরিণতির ভিত্তিতে বিচার করে থাকে। এই স্তরের অধিকারী শিশু ঠিক বা ভুল সংক্রান্ত সামাজিক নীতিগুলি আত্মীকরণ করার পরিবর্তে কর্মের বাহ্যিক পরিণতিকে মূল্য দেয়। এই ক্ষেত্রে কোন কর্ম শাস্তিযোগ্য হলে খারাপ এবং পুরস্কারযোগ্য হলে তা ভালো বলে পরিগণিত হয়। এই স্তরের অন্তর্গত পর্যায় দুটি হল :

ক. আনুগত্য এবং শাস্তি[২২]: নৈতিক বিকাশের এই প্রথম পর্যায়টি সাধারণত অল্পবয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়, তবে প্রাপ্তবয়স্করাও এই পর্যায়ের অধিকারীর মত যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে। এই স্তরে শিশু মনে করে নিয়মগুলি হল অপরিবর্তনীয় এবং পরম, আর শাস্তি এড়ানোর জন্য নিয়মগুলির মান্যতা দেওয়া প্রয়োজন। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিচার না করেই শিশুর যুক্তি হবে তার ফার্মেসি থেকে ড্রাগ চুরি করা উচিত নয়, কারণ তা আইন বিরুদ্ধ এবং ধরা পরলে তাকে কারাগারে যেতে হতে পারে। অন্যদিকে যারা বলবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত তাদের যুক্তি হবে, কেমিস্টটি ড্রাগের ন্যায্য মূল্যের থেকে দশগুণ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য্য করেছিলেন এবং হাইঞ্জ তা পরিশোধ করতেও ছেয়েছিলেন কিন্তু কেমিস্ট তার প্রস্তাবে রাজি হননি । এটি পিঁয়াজের প্রথম

[২২] Obedience and Punishment

স্তরের অনুরূপ, এই পর্যায়ে বিশ্বাস করা হয় যে নিয়মগুলিকে অবশ্যই মান্যতা দেওয়া হবে এবং যারা মান্যতা দেবে না নিঃসন্দেহে তারা শাস্তির মাধ্যমে নিয়মগুলি অনুসরণ করবে।

খ. স্বতন্ত্রতা এবং বিনিময়[২৩]: এই পর্যায়ে এসে শিশু উপলব্ধি করে যে কোন বিষয়েরই একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হিসেবে বলা হয়নি। প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র তাই তাদের স্বার্থ অনুযায়ী অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। এই পর্যায়ে শিশু তার সর্বোত্তম স্বার্থে বিশ্বাসী হয়। এইক্ষেত্রে শিশু সাধারণত অন্যের চাহিদার প্রতি সীমিত আগ্রহ প্রদর্শন করে, যদি না তা তার নিজের স্বার্থান্বেষণের কারণ হয়। এই স্তরে শিশু কোন সামাজিক সম্পর্ক যেমন বন্ধুত্ব, বিশেষ কারণবশত সম্মানিত হওয়া প্রভৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না বরং তার সমস্ত কর্ম নিজস্ব চাহিদা বা স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বে শিশুর যুক্তি হবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত কারণ তাকে কারাগারে যেতে হলেও তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলে সে অধিক খুশী হবে। অপরদিকে যারা বলবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত নয় তাদের যুক্তি হবে; কারাগার একটি ভয়ানক জায়গা তাই কারাগারে ব্যক্তির যা মানসিক ক্ষয় হয় তা স্ত্রীর মৃত্যুর শোকের তুলনায় কম।

২. প্রচলিত নৈতিকতা: সাধারণত কিশোর, কিশোরী এবং প্রাপ্তবয়স্করা নৈতিক বিকাশের এই দ্বিতীয় স্তরটির অধিকারী হয়। এই স্তরে নৈতিকতাকে সমাজের প্রত্যাশা, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিচার করা হয়। ঠিক এবং ভুলের ভিত্তিতে সামাজিক নিয়মাবলীকে গ্রহণ করা হল এই স্তরের ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্তবয়স্করা এই সময় প্রশ্নাতিরিক্ত ভাবে তাদের রোল মডেলের নৈতিক মানদণ্ডকে, কর্তৃপক্ষের নিয়মাবলীকে আত্মীকরণ করে। এমনকি নিয়মগুলির মান্যতা বা অমান্যতার জন্য কোনরকম পরিণতি নেই জেনেও ব্যক্তি এই স্তরে আইন এবং সামাজিক আদর্শ মেনে চলে। এই স্তরটি নৈতিকতার তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায় নিয়ে গঠিত।

গ. ভালো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক[২৪] : এই পর্যায়ে ব্যক্তি সমাজ স্বীকৃত নিয়মাবলীকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে নিজের অন্তর্ভুক্তি ঘটায়। এই স্তরের অধিকারী ব্যক্তি সমাজের আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করে। ব্যক্তির নৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ এক্ষেত্রে অন্যের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি অপরের অনুমোদন বা অননুমোদনের মাধ্যমে ভালো ছেলে বা ভালো মেয়ে হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। উপরোক্ত হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই পর্যায়ে ব্যক্তি বলবে, হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত কারণ হাইঞ্জের স্ত্রী প্রত্যাশা করে যে তিনি একজন ভালো স্বামী হয়ে উঠবেন। অন্যদিকে হাইঞ্জের চুরি করা উচিত নয় কারণ, চুরি করা অপরাধ এবং হাইঞ্জ অপরাধী নন, আইন না ভেঙ্গে তিনি তার সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছেন তাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

ঘ. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা[২৫] : নৈতিক বিকাশের এই পর্যায়ে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সমাজকে অখণ্ড বলে বিবেচনা করে। আইন, সামাজিক নিয়মাবলী প্রভৃতিকে মান্যতা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলিকে মান্যতা দেওয়ার মাধ্যমে সামাজিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা পায়। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর প্রত্যেকের কর্মের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকে; সমাজে তাদের নিজের ভূমিকার অপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, সামাজিক কর্তৃপক্ষ ও তাদের নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তৃতীয় পর্যায়ে যেখানে পরিবার বা বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, চতুর্থ পর্যায়ে সেক্ষেত্রে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত সমাজের সকল সক্রিয় সদস্যরা এই পর্যায়ের অন্তর্গত, যেখানে নৈতিকতা মূলত বাহ্যশক্তি

---

[২৩] Individualism and Exchange

[২৪] Good Interpersonal Relationships

[২৫] Maintaining Social Order

আরোপিত। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই পর্যায়ে ব্যক্তিগণ বলবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা অনুচিত কারণ চুরি আইন বিরুদ্ধ কাজ। অন্যদল তাদের যুক্তি দেখাতে পারে, ড্রাগ চুরি করাতে হাইঞ্জের স্ত্রী উপকৃত হবেন ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে হাইঞ্জের উচিত তার অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণ করা ও ড্রাগের মূল্য পরিশোধ করা কারণ প্রত্যেককে তার কর্মের নির্দিষ্ট ফল ভোগ করতে হয়।

৩. উত্তর-প্রচলিত নৈতিকতা: এটি হল কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের তৃতীয় এবং সর্বশেষ স্তর। ব্যক্তির এই স্তরের ভিত্তি হল সার্বজনীন নৈতিক বিধির বোধগম্যতা। এই স্তরে এসে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে, ব্যক্তি সমাজ অতিরিক্ত একটি সত্তা, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক হতে পারে এবং ব্যক্তি তার প্রয়োজনে নিজস্ব নীতিবিরুদ্ধ নিয়ম অমান্য করতে পারে। এই স্তরে ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব নৈতিকবিধি দ্বারা জীবনযাপন করে, যে নীতিগুলি মানবাধিকার, সাম্যতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতির মতো বিমূর্ত এবং সেই কারণে অসংজ্ঞায়িত। এই স্তরে ব্যক্তির কাছে বহু মানুষের সুখের জন্য, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিয়মগুলি প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু অবশ্যই তা অপরিবর্তনীয় নয় এবং প্রশ্নাতীত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই স্তরের অন্তর্গত পর্যায় দুটি হল-

ঙ. সামাজিক চুক্তি এবং স্বতন্ত্র অধিকার[২৬]: জগতে অসংখ্য দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত ইত্যাদি রয়েছে, তাই প্রত্যেকটি মানুষ, সমাজ বা গোষ্ঠীর উচিত প্রত্যেকের এই অনন্য মতামত, দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল্য দেওয়া। যা সর্বাধিক মানুষের কল্যাণ সাধন করে না এমন নিয়মনীতিকে পরিবর্তন করা উচিত, তবে এই পরিবর্তন অবশ্যই সর্বাধিক মানুষের সমঝোতা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হবে। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে হাইঞ্জের চুরি করা উচিত যারা বলবে তাদের যুক্তি হল, তার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় আর ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা নিয়মনীতি বা আইনের উর্ধ্বে। অপরদিকে যারা মনে করেন হাইঞ্জের চুরি করা উচিত নয় তাদের মতে, হাইঞ্জের স্ত্রী অসুস্থ্য হলেও কেমিস্টের নিজের ক্ষতিপূরণের অধিকার আছে, তার স্ত্রীর অসুস্থ্যতা কখনো কেমিস্টের কাজের যথার্থতা প্রদান করে না।

চ. সার্বজনীন নীতি[২৭]: কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়টি হল সার্বজনীন নীতি। সাধারণত সার্বজনীন নৈতিকতা বা নীতি ইত্যাদি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই তৈরি হয়, এবং বিমূর্ত ধারণা হওয়ার কারণে এগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, একটা রূপরেখা অঙ্কন করা যায় মাত্র। সাম্যতা, ন্যায়বিচার, মর্যাদা, সম্মান প্রভৃতি হল সার্বজনীন নীতির ভিত্তি, সমাজে নিয়মনীতি বা আইনবিধি তখনই বলবৎ হয় যখন তা সার্বজনীন নীতিকে সমর্থন জানায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির আদর্শ ইত্যাদি সামাজিক নিয়মাবলী, আইন প্রভৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিকভাবে যা গ্রহণযোগ্য এবং ব্যক্তির বিশ্বাস এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নিজস্ব নৈতিকতা বা আদর্শকেই বেছে নেয়। অর্থাৎ এই পর্যায়ে নৈতিক যুক্তি ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শের ওপর নির্ভর করে এবং ব্যক্তি তার নিজের নৈতিক নির্দেশিকার বিকাশ ঘটায় যা আইনানুযায়ী অথবা আইন বিরুদ্ধও হতে পারে। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যুক্তি হল, হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত কারণ মানুষের জীবন রক্ষা, কোন ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি অনুচিত কারণ অপর ব্যক্তিরও একইভাবে প্রাণদায়ী ড্রাগের প্রয়োজন হতে পারে এবং তাদের জীবনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে কোলবার্গের মতে, সমাজস্থ খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তাদের নিজস্ব নৈতিক নীতি দ্বারা চালিত হয় এবং নৈতিক বিকাশের এই পর্যায়ে পৌঁছতে

[২৬] Social contract and Individual Rights

[২৭] Universal Principles

পারে। একটি গবেষণায় দেখা যায় নৈতিক বিকাশের প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যায় গুলি বিশ্ব জনসংখ্যার নিরীখে সার্বজনীনভাবে দেখা যেতে পারে কিন্তু পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্যায় দুটি বিশ্ব জনসংখ্যার নিরীখে অত্যন্ত কম।
এখন বলা যায়, নৈতিকতার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনোবিজ্ঞান মানুষের চিন্তা, আবেগ, আচরণকে বিশ্লেষণ করে দেখায় যে শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত কিভাবে মানুষের নৈতিক বোধ গড়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে ব্যক্তির নৈতিক বোধ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নয়, ধীরে ধীরে তা বিকাশলাভ করে; মানুষের নৈতিক সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র যুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, ব্যক্তির আবেগ, অভিজ্ঞতা ও সমাজের প্রভাবও এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। জা পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম যে শিশু প্রথমে নিয়ম-নীতিকে কঠোরভাবে বোঝে এবং পরে ধীরে ধীরে তারা সেই নিয়মের কি উদ্দেশ্য তা বুঝতে পারে। কোলবার্গের ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম যে শিশু শাস্তির ভয় থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ন্যায়-নীতির আদর্শে পৌঁছায়।

নৈতিকতা সাধারণত বলে যে কোন পরিস্থিতিতে মানুষের কি করা উচিত আর মনোবিজ্ঞান সেই কাজের পশ্চাতে থাকা বাস্তবতা নিয়ে কথা বলে, অনেক সময়ই মানুষের বাস্তব আচরণ নৈতিক আদর্শের সাথে মেলে না, সেক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান সেই ফাঁকটি বোঝাতে আমাদের সাহায্য করে। তাই বলা যায় নৈতিকতা কেবলমাত্র কতগুলি বিমূর্ত নীতি নয়, বরং নৈতিকতা মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক অবস্থান দ্বারা গঠিত। তাই বলা যায় নৈতিকতা ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

গ্রন্থপঞ্জি:

গ্রন্থ:

১. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭।
২. মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা। ব্যক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৫।
৩. মিশ্র, পুষ্পা এবং ড. মাধবেন্দ্রনাথ, মিত্র। সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ১৯৯৪।
৪. মুন্সী, শ্রী রমেশচন্দ্র ও শ্রী রীতেন, সরকার। নীতিবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান। বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, ২০০১।

প্রবন্ধ:

১. Cherry, Kendra. "Comparing Erikson's vs Freud's Theories."
২. https://www.verywellmind.com/freud-and-erikson-compared-2795959 . Accessed 24 Oct, 2021.
৩. Cherry, Kendra. "Kohlberg's Theory of Moral Development".
৪. https://www.verywellmind.com/kohlbergs-theory-of-moral-development-2795071 Accessed 10 July 2021, 1 a.m.
৫. Cherry, Kendra. "The 4 Stages of Cognitive Development".
৬. https://www.verywellmind.com/piagets-stages-of-cognitive-development-2795457 , Accessed 15 July 2021, 10:40 p.m.
৭. Hoffman,Riley. "Alfred Adler's theories of Individual Psychology and Adlerian therapy''. https://www.simplypsychology.org/alfred-adler.html . Accessed 20 Oct 2021, 6 p.m.